দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 15-0F... পৃঃ ৮ কলাম ৫ ...

ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রী ধর্ষণ প্রসঙ্গ

দিলরুবা শবনম সীমা (রুবাইয়াৎ)

ক'বছর আগে সাপ্তাহিক বিচিত্রা একটা দেয়াল লিখনকে কভার স্টোরী করেছিল। দেয়াল লিখনটি ছিল, 'ফাইল ঠেকিয়ে ঘুষ আদায় আর পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা আদায়ের মাঝে পার্থক্য কোথায়?' সেই কভার স্টোরীর দেয়াল লেখনটি এখন আমার মনে প্রশ্ন তুলেছে যে, ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রী ধর্ষণ আর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী নিধন-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? একটি জীবন বীমা কোম্পানীর টিভিতে প্রচারত বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল নিম্নরূপ, "মায়ের কোল যেমন শিশুর জন্য নিরাপদ, জীবন বীমাও তেমনি নিরাপদ।" একজন ছাত্রীর জন্য ক্যাম্পাস যেমন নিরাপদ, একজন বন্দীর জন্যও কারাগার তেমনি নিরাপদ। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় 'ঠক বেছে গাঁ উজার করেও' আমরা আমাদের সমাজকে এইসব ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারলাম না। যার ফলে দেখা যায় ধর্ষণের তীব্রতায় ৫ বছরের শিশু তানিয়াকে আক্রান্ত হতে হয় পুলিশ কন্ট্রোল রুমের মাঝেই। পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিনকে ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়, মালিক বা মালিক পুত্র কর্তৃক কাজের মেয়েকে ধর্ষিতা হতে হয় এবং এই ধর্ষণের জীবাণু সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে মহামারীর মত। ৫ বছরের শিশু থেকে ৫ সন্তানের জননী কেউই বাদ পড়ে না। আর ধর্ষকের তালিকায় দেখতে পাওয়া যায়, সাধারণ পাবলিক থেকে শুরু করে, গৃহশিক্ষক, ডাক্তার, অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে। যাক এই ধর্ষণ ব্যামোটি গড়াতে গড়াতে এখন ভার্সিটি পর্যন্ত পৌছে গেছে, যার শিকার হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির কয়েকজন কুমারী ছাত্রী। এবং তা হঠাৎ একদিনের আচকমা কোন ঘটনা নয়, অনেকদিন যাবতই নাকি সেইসব মেয়েরা নীরবে মুখ বুজে এই জঘন্য পাশবিক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এবং তা শুধু ছাত্র নয় এখন শোনা যাচ্ছে কতিপয় শিক্ষকও নাকি এর অংশীদার।

এবার আশা যাক কারাবন্দী হত্যার প্রসঙ্গে। এদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল, তখন খুন এবং হত্যা ছিল বিরল ঘটনা। কোথাও হত্যাকাণ্ড ঘটলে সারা এলাকা এমনকি জেলা পর্যায়ে মানুষ চমকে উঠত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০/৩৫ লাখ লোকের জীবন দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর হত্যা যেন হয়ে গেছে নুন-ভাত। এবং সেই কর্মটির আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ শুরু করেছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের পূর্বসূরিরা। যাদের একমাত্র রক্ষীবাহিনীর হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল ১০ হাজারেও অধিক সাধারণ জনগণ ও বিরুদ্ধবাদী নেতা-কর্মীদের। তা ছাড়া তাদের বিশেষ বাহিনীর (ছাত্র ক্যাডার) হাতেও যে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আজ আর কেউ দিতে পারবে না। তবে ইতিহাসের পাতায় এসব ছড়িয়ে আছে। আজ সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া যাবে না এই ন্য যে, তখন যারা খুন হয়েছে অনেকের নায় মামলা করারও অধিকার ছিল না।

ই যে হত্যা, খুন ও গুম সহজলভ্য ব্যাপার য় দাঁড়াল, তার পর তা গড়াতে গড়াতে য় জেল হত্যা পর্যন্ত গড়াল। পুলিশের পিটুনি খেয়ে কারাবন্দীর প্রাণ হারানোর া যেমন ঘটল, তেমনি জাতীয় চার ও জেল হত্যার শিকার হলেন।

মে হত্যা ও ব্যভিচার উভয়টার শাস্তিই ও। দেশের প্রচলিত আইনেও হত্যার ত্যুদণ্ড এবং ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন ও। একজন পুরুষের প্রাণ হারানো একজন কুমারী সতীত্ব হারানো ই সমান। সতীত্ব বা কুমারীত্ব নারীর প্রাণ, যা আল্লাহর সীলমোহর যাকে অনধিকারভাবে উন্মোচিত করতে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ইউরোপ-আমেরিকার কিছু কিছু দেশে অবাধ যৌন স্বাধীনতা থাকলেও সেখানে ধর্ষণের স্বাধীনতা কারো নেই। তাই এমন ঘটনা হয়ত এমন ভয়াবহ ও ব্যাপকভাবে পৃথিবীর কোন শিক্ষাঙ্গনে এমনভাবে ঘটেনি, যেমনভাবে ঘটেছে বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে।

অথচ, দুঃখের বিষয় এটাই যে, এর ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা এতই শীতল ও মৌন এবং সরকারের পক্ষ থেকে এর প্রচারণা এতই নগন্য যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা দুঃসাধ্য। পাশাপাশি জেল হত্যার ঘটনার মত ঘটনার জন্য সরকারের প্রচারণার কোনই কমতি নেই এবং সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও বাকী নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে (ছাত্রী ধর্ষণের) সরকার কি করেছেন? কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কি-ইবা ব্যবস্থা নিয়েছেন '৭৪/৭৫-এ হাজার হাজার মানুষ হত্যার ব্যাপারে। জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটির ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় দেশের সব পত্র-পত্রিকাতেই কমবেশী লেখালেখি হয়েছে এবং এখনও চলছে। এই ধর্ষণের ঘটনার প্রহসনমূলক বিচারের সংবাদটি ২৯ সেপ্টেম্বরের দৈনিক জনকণ্ঠ সংবাদ শিরোনাম করেছিল। শিরোনামটি ছিল, 'ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনায় জাবি'র পাঁচ ছাত্র বহিষ্কৃত'। প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি: "বহুল আলোচিত ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই পাঁচ ছাত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি ধর্ষণের অভিযোগ ছিল। সরাসরি ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত অপর দুই ছাত্রকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রী ধর্ষণে সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত ছয় ছাত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। ছাত্রী ধর্ষণে জড়িত তিন বহিরাগতদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।"

এবার আসা যাক বহিষ্কৃত ছাত্রদের পরিচিতি সম্বন্ধে। (১) জসিম উদ্দিন মানিক। সে ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিল। তাকে চিরতরে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। (২) শেখ মিরাদুল ইসলাম সে বাংলা বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক ছিল। তাকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত করা হয়। আতিকুর রহমান নাঈম, সে ছিল ইতিহাস বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্র লীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক। তাকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে দু'বছরের জন্য। (৪) ইতিহাস বিভাগের অপর এক ছাত্র গোলাম মোহাম্মদ আলী ডালাসকে বহিষ্কার করা হয়েছে তিন বছরের জন্য। (৫) এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হলেও সদাচরণ করার শর্তসাপেক্ষে নাবিউল হক রানার বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করা হয়।

ছাত্রী ধর্ষণের সরাসরি অভিযোগে অভিযুক্ত দু'জনকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এরা দু'জন (১) ছাত্র লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিবুর রহমান বরকত, ভূতত্ত্ব বিভাগ। (২) ছাত্র লীগ কর্মী আনিসুর রহমান ইংরেজী বিভাগ। অপর ৬ জন ছাত্রের উপর আনিত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সব মিলিয়ে ১৩ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেটি, সেটি হল ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় দু'জন বহিরাগতও জড়িত ছিল। এদের একজনের নাম সোহেল, অপর জনের নাম মুকুল। তবে এতেই বা এত আশ্চর্য হবার কি আছে। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা ভার্সিটি থেকে আন্তঃ জেলা ডাকাত দলের সর্দারকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। যে ভার্সিটিকে কবি আল মাহমুদ "ডাকাতদের গ্রাম" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন '৮০'র দশকেই।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যে আইনের অধিকারে এই বিচার করেছেন, তাহলো বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর প্রথম সংবিধির ২(৮) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা বিধির ৫নং ধারাবলে।

অথচ পাবলিক যখন ধর্ষণ করে, তখন এর বিচার হয় দেশের প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের আওতায়। এমনই একটি ধর্ষণ মামলার বিচারের সংবাদ ছেপেছে ১৪ অক্টোবর জনকণ্ঠে। সাংবাদটির শিরোনাম ছিল: "ধর্ষণ মামলায় ৮ জনের যাবজ্জীবন"। কুমিল্লা থেকে ১৩ অক্টোবর নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। মিলনী বেগম ধর্ষণ মামলায় কুমিল্লা জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ইকতেদার আহমেদ গত বুধবার এক রায়ে অভিযুক্ত ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছেন। কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হল– আমান মিয়া, সুন্দর আলী, আবদুল মুন্নাফ, মোমিন, মান্নান, আলী আকবর, মফিজুর রহমান ও মনা। জনকণ্ঠ ১৪ আগস্ট '৯৮ পৃঃ ১১।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার ইজ্জতের দাম বেশী? মিলনী বেগমের নাকি ভার্সিটির ছাত্রীদের। যদিও পত্রিকার রিপোর্টে মিলনী বেগমের সামাজিক যোগ্যতাও পরিচিতি তুলে ধরেনি, যদি মিলনী বেগম একজন সাধারণ মহিলাও হয়ে থাকেন তাহলেও পুরোপুরি একজন নারীর মর্যাদা তাকে দিয়েছে আইন। নারীর সতিত্ব সামাজিক যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে নির্ণয় করা হয় না। এটা লালনের সেই গানের মতই, নানার বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ...। কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্তমান সরকার (যে সরকার প্রধান নিজেও একজন মহিলা) এটাই প্রমাণ করল যে, নারীরা যতই বেশী ডিগ্রী নিতে থাকে, তাদের ইজ্জতের মূল্যও ততই কমতে থাকে এবং একইভাবে ছেলেদের (ভার্সিটির) বাড়তে থাকে। যার ফলে যেখানে মিলনী বেগম ধর্ষণ মামলায় ৮ জন সাধারণ পাবলিকের (যারা অনেকেই আইন-কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ) হয়েছে যাবজ্জীবন, সেখানে ভার্সিটিতে সরাসরি ধর্ষণকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েও পাঁচজনের মাঝে ১ জনকে একেবারে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, ২ জনকে ৩ বছরের জন্য, ১ জনকে দু'বছরের জন্য আর আবার একজনকে ধর্ষণ করার পর এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেও পুনরায় সদাচরণ করার শর্তে মাফ করা হয়েছে মানে বহিষ্কারাদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে। একজন ধর্ষণকারী ধর্ষণের পর এমন তার কি আর সদাচরণ বাকী থাকতে পারে। যা সে করবে? তার মানে সে প্রমাণ করবে এটাই যে, সে আর ছাত্রী ধর্ষণ করবে না। বাকী যে তিনজন ধর্ষণ করে মাফ নিয়ে গেছে, তাদেরকে তিন বছরের এবং ২ বছরের অবকাশের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে। ভালো হত যদি তাদেরকে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সরকারী খরচে বিদেশ পাঠাতেন। এটা বিচার নয়। একে বলা যায় গরু মেরে জুতা দান!! আর এটা যে, কাদের নির্দেশে কাদেরকে ছত্রছায়া দানের জন্য করা হয়েছে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ছিঃ! যে সরকার কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, নারীর অধিকারের কথা বলে, ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন সন্তানরা মায়ের পরিচয় দিতে পারবে– যেভাবে এখন বাপের পরিচয় দেয়। যে সরকার বলেন অন্ন জোগায় নারী। তাঁর কাছেই কি নারীর এই মূল্য এই মর্যাদা আর এই বিচার? শ্যামকে রাখতে গিয়ে কি কুলকে এভাবে মানুষ কলংকিত করে?

২০ অক্টোবর আনোয়ারা হক সৈয়দ না-কি তার কলামে এই জাঃবিঃ-কে "সতিত্ব হারানোর বিশ্ববিদ্যালয়" উপাধি দিয়েছেন। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে জাঃবিঃ'র প্রফেসর জসিম উদ্দিন আহমদ সাহেব ৩১ অক্টোবর জনকণ্ঠে একটি প্রতিবাদ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, আনোয়ারা হক সৈয়দ না-কি তার লেখার এক জায়গায় লিখেছেন ডিগ্রীধারী শিক্ষকরা খবরটি (ছাত্রী ধর্ষণের) শোনার পরও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খবর চেপে রেখেছে। আরেক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, "যে সকল শিক্ষকের নামে ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাদের জন্যও আরেকটি শিক্ষকের যৌনাচার কমিটি করে তদন্ত কাজ শুরু করা হোক।" অবশ্য প্রফেসর জসিম এর প্রতিবাদ করেছেন সত্য নয় বলে। তবে এতে আমাদের মনে আরও নতুন একটি ধারণাও উঁকি দিল যে, এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও অন্তর্ভুক্তি থাকতে পারে। কারণ, তাদের এই একপেশে তড়িঘড়ি করে বিচারের নামে প্রহসন প্রমাণ করে তারা ছাত্রদের ছত্রছায়া দিয়েছেন। এর কারণ দু'টো। এক. ছাত্রদের ভয়ে। কারণ ছাত্ররা সরকারের পোষ্য। দুই. বেশী ঘাঁটালে কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরোয়। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুধু সতিত্ব হারানোর বিশ্ববিদ্যালয়ই দেয়া উচিত নয় আরও বড় কিছু দেয়া উচিত যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছে মাসের পর মাস।

একই দেশের নাগরিকের জন্য দুই আইন হতে পারে না। ছাত্ররা কোন আলাদা গ্রহের বাসিন্দা নয়। কিন্তু সরকারের নীরব ভূমিকা বড়ই রহস্যময়। কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী নিধন আর ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রী ধর্ষণ কোনটাই কম গুরুত্বের নয়। কিন্তু একটার বেলায় সরকার যতটা সরব অন্যটির বেলায় ততটাই নীরব।